চতুর্থ অধ্যায়

কবিতায় দেশভাগ ও উদ্বাস্তু-চেতনা

অসমের বাংলা কবিতায়দেশভাগ ও উদ্বাস্তু চেতনা প্রতিনিয়ত বিদ্যমান। ভারত বিভাগের ফলে প্রচুর বাঙালি বাংলাদেশ থেকে এসে অসমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অসমের বাঙালির কবিতা চর্চাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। শিলচর শহরকে ঘিরে বরাক উপত্যকার জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই বাঙালি। আর তাই বহুকাল ধরেই বরাকের বাংলা চর্চা বেশ ঋদ্ধ । যা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা সম্পর্কে বলা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চল থেকে প্রথম বাংলা কবিতার বই প্রকাশের ঘটনাও খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। এরপরও ব্রহ্মপুত্র কবিদের নিজস্ব কণ্ঠ গড়ে উঠেছে।

প্রাবন্ধিক মানিক দাসের[১] একটি অমূল্য লেখা থেকে জানা যায়, ১৮৭২-১৮৭৬ সময়কালে গুয়াহাটি, ধুবড়ি, শিলং ও গোয়ালপাড়া থেকে যথাক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল আসাম মিহির,[২] হিতসাধিনী,[৩] সাহিত্যসেবক[৪] ও তথ্যহীন একটি পত্রিকা। এই পত্রিকাগুলির সাপেক্ষে একটি তথ্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা ভাষাচর্চা বেশ পুরোনো। ঊনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ঢেউ এসে পড়েছিল অসমেও।

মানিক দাস লিখেছেন, 'অসমের বাঙালিরা মূলত ছিন্নমূল। এক বৃহৎ অংশ উদ্বাস্তু। উদাস্তুদের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়। ... এই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে উদ্বাস্তুদের কাজকর্মে, জীবনযাপন, সংস্কৃতিচর্চা আর আত্ম-আবিষ্কারের ভাষায়। নতুন জায়গায় শিকড় গাড়তে, থিতু হয়ে বসতে সময় লাগে।'

অসমে বিশেষত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, বাঙালিরা অনাহূত অতিথি। অর্থনৈতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণেই বাঙালিদের আগমন ও অবস্থানকে একাংশ অসমিয়া মেনে নিতে পারেননি। যাবতীয় প্রতিকূলতা মাথায় নিয়ে টিকে থাকার কথাই শুধু ভাবেন বাঙালিরা। অন্নচিন্তা মুখ্য হওয়ায় অন্য চিন্তা গুরুত্ব হারায়।

অসম বাঙালি জাতিসত্তার ভাষিক সংকট নিয়ে অসম, পূর্ববঙ্গ, বঙ্গ, ত্রিপুরার বিশিষ্ট বাঙালি ও অসমিয়া লেখকদের রচনার একটি সংকলন ইতিপূর্বে বেরিয়েছে "আসামে বাংলাভাষার সংকট"[৫]— এই শিরোনামে। অসমের বাঙালিদের উদ্ভূত সংকট যা বাঙালি জাতিসত্তাকে প্রভাবিত করছে, তার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভিন্ন ভাবনা-চিন্তা-যন্ত্রণা ও অভিজ্ঞতালব্ধ মনন থেকে উঠে এসেছে এই সংকলনটি। অহরহ দেখা যায় ভাষা দাঙ্গার স্বরূপ, দেখা যায় বিদেশি হঠাওয়ের দুঃসহ প্রতিচ্ছবি। কখনোসখনো খুব

পরিচিত লোককেও এসবের শিকার হতে দেখা গেছে। এবং সেই যন্ত্রণার তাপের আঁচ এসে আমাদের দেহমনেও স্পর্শ করছে। ফলে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া থেকে আমরা কেউই মুক্ত নই। বিদেশী শনাক্তকরণ ট্রাইবুন্যালের কীর্তি বরাক উপত্যকাতেই এমন সব ঘটনার সৃষ্টি করছে তা প্রকৃতার্থে এমন লোমহর্ষক, প্রায় সেই প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক হয়ে বহু অকথ্য হয়রানির সম্মুখীন হতে হচ্ছে অসমের মানুষকে। ট্রাইব্যুনালের পুলিশই অব্যবস্থার শিকার। অসমের খিলঞ্জিয়া[৬] বাঙালিদের আত্মহত্যা করে মরতে হয়েছে শুধুমাত্র দারিদ্রের জন্য কারণ, তাদের নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হলে যে আইনি ক্ষমতা বহন করতে হয় সেটা বহন করার ক্ষমতা ওদের নেই, আবার এই জন্যই শুধু বিদেশী শিরোপা নিয়ে বাকি জীবন জেলে বা ভিন্ন দেশের মাটিতে যাওয়াটাও যে কম অপমানের নয়। আবার ডিটেনশন ক্যাম্পের[৭] ব্যাপারটাও কম অপমান বা অসম্মানের নয়। চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসবাদী, উন্মাদ এদের কেউ না হয়েও শুধুমাত্র নাগরিকত্বের মীমাংসার অভাবে থাকতে হচ্ছে ওদের, নারকীয় যন্ত্রণায় ভুগতে হচ্ছে। এ যে মানবাত্মার অপমান। এত ঈশ্বরও সইবেন না। এসব খুবই হৃদয় সংবেদী। আর যেকোনো হৃদয় সংবেদী অনুভূতিই সাহিত্যের উপাদান।

ঊর্ধ্বেন্দু দাস[৮] "বিষণ্ণ পরবাস নির্বাসন নয়"[৯] কবিতায় লিখেছেন—

'খাঁ খাঁ দুপুরের লাল মেঠো পথ ধরে কারা হাঁটে—
নিসর্গ কাঁপিয়ে জাগে টুরিস্ট চিলের তীব্র ডাক
পাহাড়ের ছায়াঘেরা পত্রল চড়াই ভেঙে
ভেঙে ভেঙে উঠে গেল তিনটে দাঁতাল'

(উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ৮২)

উক্ত পঙ্‌ক্তিগুলিতে অসমের পাহাড়ঘেরা অঞ্চলের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। যেখানে অদূরে ঝর্না থেকে ভেসে আসে চিতলের 'আর্তস্বর' আর 'শিকারী চিতার ক্রুদ্ধ আস্ফালন' এবং উড়ন্ত পাখির কোলাহল। 'অরণ্যে কাঁপন লাগে', আন্দোলিত শিরীষ, নাহর, দেবদারুর 'শাখায় প্রশাখায় লক্ষ্য তর্জনীর শাসন ছড়ায়।' বস্তুত এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটি অরণ্যের ছবি ফুটে উঠলেও আদপে ফুটে উঠেছে অস্বস্তিকর অসম আন্দোলন এবং বাঙালিদের 'পরবাসী' হয়ে যাওয়ার আর্ত-ভয়। কারণ কখন শিকারি চিতার মতো অসম আন্দোলনকারীরা চিতার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙলিদের ওপর। এই ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে যে লক্ষ্য তর্জনীর শাসন তাতে একদিকে যেমন বাঙালির আত্মরক্ষার তাগিদ অন্যদিকে নিজের বাসভূমিকে ছেড়ে যাবার দুঃখ দুটোই একসঙ্গে রয়েছে। কবি দেখছেন পথ চলতে চলতে অসমের মোহিনী ছায়ায় নিয়নের আলোয় কংক্রিটের রাস্তায় নির্মম অসম আন্দোলনের ঘাম রক্তের ছাপ। বস্তুত কবি অসমে এসেছেন পূর্ববঙ্গ থেকে। পূর্ববঙ্গের বাস্তুভিটে-হারা মন কবিকে কষ্ট দিলেও অসমের প্রকৃতি কবিকে আপন করে নিয়েছে। তিনি পরবাসে এসেছেন বটে, কিন্তু তাঁর নির্বাসন হয়নি। তিনি চাইছেন এই অসমকে আপন করে নিতে। কিন্তু হায়! কেন যেন কোন এক অজানা কারণে এই প্রবাসের বাসিন্দারা তাঁকে আপন করে নিতে চাইছে না। কবি বুঝতে পারছেন না তাঁর দোষটা কোথায়। কেন এখানের লোকেরা তাঁকে আপন করছে না। অস্থির অসমে চতুর্দিকে জীবাশ্মের অন্তহীন স্রোত। চতুর্দিকে যেন এক

অদ্ভুত আঁধার থেকে জেগে ওঠে কফিনের ঘ্রাণ।

অস্তিত্বের কূট-প্রশ্নে শৃঙ্খলিত মানুষের মায়াবী দুচোখে
শ্বাপদের ছায়া দেখে কখনও অলক্ষিতে আঁতকে ওঠে যযাতি-সময়—
রতি-বিস্মৃতির মাঝে অতর্কিত পক্ষাঘাত নেমে আসে দম্পতির উজ্জ্বল শরীরে
আণবিক বিস্ফোরণে বেমালুম উড়ে যায় প্রজন্মের ছেঁড়া-তমসুক
ত্রিশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয় মন্দির, উদ্যান, রথ, মন্ত্রপূত অস্থি-র আয়ুধ
অজাত শিশুর ক্রুদ্ধ অগণন বজ্রমুষ্ঠি টেনে ধরে জরায়ুর ঘুরোনো হাতল
সোনালি নদীর স্রোত সহসা নিথর হয়
স্তম্ভিত ইথারে ভাসে প্রেতকীর্ণ লোল অট্টহাসি
ঃ 'ফিরে যাও ভ্রান্ত পরবাসী'—

আবার সেই এক ধ্বনি— 'ফিরে যাও ভ্রান্ত পরবাসী'। কিন্তু কবি ফিরে যাননি। তবে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন তাঁর সেই বাস্তুভিটের দেশ বাংলাদেশে। কারণ এই প্রবাস তাঁকে শান্তিতে টিকতে দিচ্ছে না। তিনি জলের উজান বেয়ে শ্রান্ত পদে ফিরে আসেন "আয়ুষ্ক্রান্ত সময়ের স্থির ব্যবধানে।" অসমের প্রকৃতি তাকে এতটাই আপন করেছে যে সোনালি নদীর গান তিনি শুনতে পান অর্কিডের সমারোহে। বিভিন্ন চিত্রিত পাথর, সবুজ পাহাড় যেখানে যৌবন স্থির হয়ে আটকে আছে, কিন্তু তাঁর মতো মধ্যবয়স্কদের সামনে কোনো প্রশ্ন তুলে দাঁড়ায় না। থাকুক না মানুষের অনুশাসনের বেড়া। কাঁটা কম্পাসের গেরো। শাসনে উদ্ধত আকুল, এখানে অহল্যা হয়ে আছে কেবল পালক গোনা উদয়াস্তহীন এক ঋত্বিক সূর্যের বালিশ। যার ওপর মাথা রেখে স্থির নেত্রে অগণন মেরুযাত্রী হাঁসের ঝরা পালক গুনতে কবির ভালো লাগে। হাতের উপর থুতনি রেখে আকাশে 'এক দুই-তিন-চার-হাজার নিযুত' তারা গুনতে তাঁর ভালো লাগে। কিন্তু এক সময় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন এই ভাবনায় যে হয়তো একদিন তাঁকে সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যেতে হবে। অসমের প্রকৃতির এসব বিচিত্র ফুল, অদ্ভুত নামের নদ-নদী, বর্ণময় অরণ্য, পাহাড়, নীল আকাশ, জনপদে কিছু প্রিয় পরিজন সব ছেড়ে হয়তো তিনি চলে যাবেন। ঠিক—

'সব ছেড়ে চলে যাব— যেমন হাঁসেরা যায়
কয়েকটি ঋতুর ব্যবধানে—'

(তদেব, পৃ. ৮৩)

আবার কবি ফিরে যাবেন যেমন হাঁসেরা যায়। সোনাই, ধলেশ্বরী, আম, হিজলের দেশে। যেখানে হাকালুকি[১০] চাতলার ডুবো মাঠে কমলালেবুর বনে আনারসের টিলায় কবির পিতামহদের অস্থি রয়েছে সেই অস্থি খুঁজতে যাবেন কবি চাঁদনি রাতে।

বাঙালি মায়ের হাতে রুপোলি চাঁদের টিপ, বাঙালি বোনের হাতে রক্তচন্দনের ফোঁটা নিতে আবার তিনি জন্মভূমিতে ফিরে যাবেন। যেখানে বাঙালি নারীর প্রেমে আস্বর্গ সংসার ভুলে বাংলার ভাটিয়ালি, কীর্তন, রবীন্দ্রগীতি, বাউল, ভাসান পালা, সারি জারি গান শুনতে বারবার কবি ফিরে যাবেন জীবনানন্দের

সেই প্রিয় ফুল পাতা পরিচিত পাখিদের ভিড়ে।

২) বার বার ফিরে আসব, অইসব নদী মাঠ
জীবনানন্দের প্রিয় ফুল-ফল, তরু-লতা,
পরিচিত পাখিদের ভিড়ে...
অনন্ত-নক্ষত্রবীথি নীলিমায় আজ শুধু নির্বিকার ভেসে যেতে হবে
ব্লিজার্ড-তাড়িত অই মেরুপাখিদের মতো
আয়ুষ্ক্রান্ত সময়ের কীর্ণ-হাত ধরে'—
অস্ত্যোদয়হীন অই সূর্যকে শিয়রে রেখে,
এইসব গিরি-নদী-অরণ্যের সীমানা ছাড়িয়ে
দেহ থেকে দেহান্তরে, খুঁজে নিতে হেমপাত্র
মৃত্যুজিৎ আত্মার
আশ্রয় —
'বিষণ্ণ পরবাস ঃ নির্বাসন নয়।' ...

বস্তুত এই অসমের এই প্রবাসে এসে কবির যে অভিজ্ঞতা তা একদিক থেকে প্রাকৃতিকভাবে যেমন কবিকে সন্তোষ দিয়েছে মানসিকতার দিক থেকে ততটাই কবি অপমানিত হয়েছেন। কারণ অস্থিরতম অসম তখন বিদেশী হঠানোর আন্দোলনে মত্ত হয়ে যে অত্যাচার করেছে তা নিঃসন্দেহে নৃশংস এবং অমানবিক। প্রসঙ্গত এখানে মনে পড়ে যায় 'রিফিউজি' সিনেমার সেই গানটির কথা—

পন্‌ছি নদীয়া পবন কে ঝোকে।
কোই সরহদ না ইন্‌হে রোকে
সরহদতো ইনসানোকে লিয়ে হ্যায়
দেখো হম অওর তুমনে
ক্যায়া পায়া ইনসা হোকে।

(পাখি, নদী কিংবা বাতাসের বেগকে কোনো কাঁটাতারের বেড়া রুখতে যায় না। তথাকথিত সীমানা তো শুধু মানুষের জন্য তৈরি হয়েছে। দেখো আমি আর তুমি মানুষ হয়ে কী পেলাম?)

— এই গানের অর্থটা কোথায় যেন ঊর্ধ্বেন্দু দাসের 'বিষণ্ণ পরবাস : নির্বাসন নয়' এই মানসিকতার সঙ্গে মিলে যায়।

বস্তুত উগ্রতা মানুষের জ্ঞানচক্ষু অন্ধ করে দেয়। ব্যক্তির জীবনই হোক, গোষ্ঠীর জীবনই হোক, সর্বক্ষেত্রেই তা সত্যি। উগ্র জাতীয়তাবাদে অভ্যস্ত জনগোষ্ঠী উগ্রতাকে লালন পালন করতে করতে একসময় সভ্যতার শত্রু হয়ে যায়, ফলে নিজেকেও ক্রমাগত অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। বাইরের (চর্মচক্ষু) দুই চোখ দিয়ে গাছ ফুল লতাপাতা এমনকি জটিল যন্ত্রের ক্ষুদ্রতম অংশও দেখতে পায়। বই পড়তে পারে। উঁচু ডিগ্রি লাভ করতে পারে। সাতমহলা বাড়ি বানাতে পারে, কিন্তু নিজেকে চিনতে পারে না, তার লোভও প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে উগ্রতা বশে বেঁধে ভোটে হারিয়ে দেয়। জাতীয় জীবনে গ্রহণ করতে পারে না। দূরে তাড়িয়ে দেয়, আর সেইসব মহৎপ্রাণ মানুষ স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উন্নত জনগোষ্ঠীর মাঝখানে বসবাস করতে বাধ্য হয়। আমরা জানি সেই শংকরদেবকেও একদিন উগ্রতার কাছে হার মেনে অসম ছেড়ে প্রতিবেশী রাজ্যে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, তেমন ধারা এমনও বিদ্যমান। ধর্মীয় উগ্রতা, উগ্র জাতীয়তাবাদ—সকলের একই চরিত্র। এখানে মনে রাখা উচিত বিপ্লবী রাজনীতির মানুষকে শাসক শ্রেণি উগ্রপন্থী বলে চিহ্নিত করে, "আমি তাদের উগ্রপন্থী বলছি না। এরা রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চায়, শোষণ মুক্ত সমাজ গড়তে চায়, আমি যাদের উগ্রতার কথা বলছি তারা আসলে বিচ্ছিন্নতাবাদী, দেশের উন্নতির জন্য পরিবর্তন নয়, এরা দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চায়, দেশের ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের উপর অত্যাচার করে। এক দলের কর্মের উৎসে থাকে উচ্চ হৃদয়বৃত্তি ও মানব প্রেম, অন্যদলের কর্মে প্রকাশিত অমানবিক হিংস্রতা ও হৃদয়হীনতা।" (লালন মঞ্চ[১১]/বিজিৎ ভট্টাচার্য[১২])

আবার ঊর্ধ্বেন্দু দাস 'সাকিন আসাম, ১৯৮৩'-তে অসমের আন্দোলনের এক ভয়াবহ ছবি তুলে ধরেছেন। অসম আন্দোলনে যে মানুষের ভগ্নস্তূপ তৈরি হয়েছিল যেখানে আশি বছরের 'নানিমা' থেকে বাষট্টির পোড়খাওয়া হানিফ চাচার ঝাঁঝরা হওয়া শরীর মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে এমন এক অসমে সে সময়টা বসন্ত, বসন্ত সবুজের আবাহন, প্রেমের ডাক। আর সেই বসন্তই অসম আন্দোলনের সময় হয়ে উঠেছিল শস্যহীন মাঠ। যেখানে মানুষের জান্তব মানসিকতা পদচ্ছাপ রেখে গেছে, খোদার মসজিদ কিংবা ঈশ্বরের নামঘর সবাই এখন মৌনী। কারো মুখে এমন আর কোনো উত্তর নেই। না ঈশ্বর এসেছেন বাঁচাতে না খোদা। শুধু শতাব্দীর মাঝে টানা এক অন্ধকার পথ। কী ভয়াবহ সেই দৃশ্য যেখানে পথের দুধারে ছিন্ন শিশুর শরীর, বিভিন্ন প্রৌঢ়ের কাটা মাথা, কিংবা দীন জননীর যুগল উরোজ পড়ে রয়েছে। এধারে ভরলী ওধারে কলঙসূঁতি, কপিলী, দিখৌ, লুইতের পার ধরে জলের উজানে কিংবা ভাটায় যেদিকেই তাকানো যায় চতুর্দিক শ্মশান। চাপরি থেকে শুরু করে গোরেশ্বর, গেলি, গহপুর, নওজান, হাজো— সর্বত্রই চিতা জ্বলছে। কারণ অসমের ভূমিপুত্ররা চায় 'এই জুই জ্বলিছে জ্বলিব।' কবির প্রশ্ন যারা বলে এ আগুন জ্বলছে এবং জ্বলবে এরা আসলে কারা। এরা কি প্রকৃতার্থে মানুষ, নাকি মানুষের শব ঘিরে থাকা অশরীরী প্রেত বা পিশাচ। যারা বলে 'এই যুঁজ মানুহর অস্তিত্বর যুঁজ।' তারা কি আদৌ মানুষ? বুলেট ও তিরের মুখে ছোরা-ভোজালির কোপে তামাম নসীব ভূলুণ্ঠিত। তাহলে এটা মানুষের যুদ্ধ হল কীভাবে। মানুষের যুদ্ধে তো মানুষ মরে না, মানুষের যুদ্ধ তো হয় সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক ভাবে। যেখানে একটা মোড় ঘোরে। কিন্তু এ তো অমানবিকতার চরম প্রকাশ।

বুনো উলুঘর আর হোগলা পাতা দিয়ে তৈরি হয়েছে অগণন আশ্রয় শিবির, যা এই জান্তব যুদ্ধের পরিণাম। আর সেই আশ্রয় শিবিরগুলি নিরন্তর ভেসে চলেছে স্বামীহারা, পুত্রহারা, ভ্রাতৃহারা, মাতৃহারা, পিতৃহারা, জায়া, জননী, বোন এবং অনাথ শিশুদের অশ্রুবন্যায়।

এধারে ভৈয়াম আর অন্য ধারে লেখকেরই পরিচিত তেত্রিশের সোনাবৌদি আর মাত্র তেরো বছরের কিশোরী একটি বোন, ডুয়ার্সের শিবিরের শরণার্থী। যারা পেটের জ্বালায় আর কোনো রাস্তা না পেয়ে নিজের শরীরটাকেই বিকোতে দাঁড়িয়েছে রাজপথে। স্বদেশ পেতে গেলে এ লজ্জাও যে বহন করতে হয় সেই ঘৃণ্যতম শতাব্দীকে কবি কায়মনোবাক্যে ঘৃণা করেছেন। ভাষা ধর্ম প্রজাতির নামে যে যুদ্ধ এই অঞ্চলের ভূমিপুত্ররা চালিয়ে যাচ্ছে এ তো পাপ। এ তো মানুষের কর্ম নয়, এ তো পিশাচের কারবার।

'তিন সমুদ্রের জল, সাতাশ নদীর ঢল, এসেছিল পেরিয়ে সেবার

গুটিকয় ধড়িবাজ লালমুখো দানো,—

বাঁহাতে তাদের টানা ফিরিস্তি, ডান হাতে রঙিন আতস-কাচ ; বলে

ওরা নাকি এদেশের মানুষের নিরঙ্কুশ ভালো করতে চায়।' (তদেব, পৃ. ৮৬)

কবি দেখেছেন হাড় কাঁপানো শীতের রাতে কিছু হলুদ-ছোপানো মুখ আর কিছু শিকারি শ্বাপদ তাদের পকেটে চড়াই ইস্তেহার নিয়ে এসেছে, 'ওরা নাকি মানুষের তমাম নসিব বদলে দিতে চায়।'

কবির জিজ্ঞাসা কোথাও কী মানুষ ছিল যে মানুষের নসীব বদলাবে। যেখানে মানুষ থাকে সেখানে ভালোবাসা থাকা পুষ্পিত পথ থাকে কুসুমের চোখে দীপাবলি থাকে। এ সমস্ত হারিয়ে মানুষ আজ হয়েছে হিংসা ও হননের পথের যাত্রী। মানুষের চোখ থেকে আলো নিভে গেছে বহুদিন ; মানুষের সবই গেছে, রয়েছে শুধু পতন ও বিনাশের এক 'প্রাতিস্বিক ভয়।'

অথচ এসব নিয়েই ছবি আঁকে গান বাঁধে ভাড়াটে শিল্পীরা। শুধু হয় 'কুকুর কেত্তন'। সংবিধান মতের ঢলাঢলি আর মাতামাতি হয়। দিল্লি থেকে ছুটে আসে কখনো-বা হিন্দুর অভিভাবক অথবা মুসলমানের ফুফা, আর এ অমানবিকতা দেখে খেপে ওঠেন মাদার টেরিজার মতো মানবিক মুখ।

কবি দেখেছেন হাজার বছর ধরে এই পথ ধরেই হেঁটে গেছে মানুষের মুখ। এই পথে ফিরে এসেছে অন্তহীন মানুষের মুখ, হাজার বছর ধরে উদয়াস্ত মানুষের মিছিল ছিল এই অঞ্চলে। কে অসমিয়া। কে বাঙালি। কেই-বা হিন্দু আর কে মুসলমান। কে কার জাত-ধর্ম-ভাষার খবর রাখে। এরা সবাই একে অপরের আত্মীয় ছিল। তাইতো গাঁয়ের মেয়েটি বধূ হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছে বলে জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষার অপেক্ষা না রেখে গাঁয়ের সকলেই কাঁদে, আবার যখন গাঁয়ের দামাল ছেলেটি একটি রূপবতী মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসে তখন আনন্দে নেচে ওঠে সমস্ত গ্রাম। একসঙ্গে নামঘরে যেমন 'চাকি' জ্বলে আর মাজারে জ্বলে মোমের শিখা। আসাদ ভাই আর পানিরাম বরা দুজনেই দাদু হওয়ার খুশিতে নেচে ওঠে। পানিরাম বরা 'ককাদেউতা' হওয়ার খুশিতে নামঘরে চাকি জ্বালাতে যাওয়াতে আসাদ ভাইয়ের নাতির মুখ দেখে তবে যায়।

কিন্তু হায়, আজ এই পরিত্যক্ত গাঁয়ের চাতালে এই মনুষ্যত্ব, এই বুকে এই আনন্দের জোয়ার কোথায় হারিয়ে গেছে। পরিবর্তে হন্তারক মানুষের জান্তব পদচ্ছাপ। বুকে বীজপত্র— শস্যহীন, নদী ও নক্ষত্রহীন আদিগন্ত ওই বসন্তের মাঠ। লুইতের পার ধরে উজানে যাও কিংবা ভাটায় যাও সর্বত্র এই চিতা জ্বলছে। চতুর্দিকে কেবল শ্মশান আর শ্মশান।

হাজার বছর ধরে যদিও এই পথ দিয়ে শোনা গেছে কল্লোলিত জীবনের গান, কিন্তু ১৯৮৩-র সেই

সময়টা মানুষকে এমনভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে যে আজও তার প্রতিচ্ছবি অনেকের চোখেই ভেসে ওঠে। এবং যদিও আজ পরিস্থিতি বদলেছে, কিন্তু অসম আন্দোলনের প্রভাব বাঙালি অসমিয়ার সম্পর্কে কোথাও যেন এখনও একটা ছোট্ট ফাটল ধরিয়েই রেখেছে যা কোনোদিন মিটবে কি না বলা অসম্ভব।

বরাকের কবিদের মধ্যেও দেশভাগের এবং উদ্বাস্তু জীবনের প্রভাব গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। আর তার সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে উঠেছে শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর[১৩] 'উদ্বাস্তুর ডায়েরি'— কবিতায়।

কবিতার নামের মধ্যেই উদ্বাস্তু কথাটা রয়ে গেছে। দেশভাগের পর এক বৃহৎ অংশ বাঙালি অসমে চলে আসে। বাংলাদেশ বিভাজনের পর শ্রীহট্ট চলে গেল বাংলাদেশে আর কাছাড় চলে এল অসমে। সন্দেহ নেই কাছাড়কেন্দ্রিক এই বসবাসকারীকেই বরাক উপত্যকার বাসিন্দা বলা হচ্ছে। বরাকের এক অন্যতম কবি 'শক্তিপদ ব্রহ্মচারী'। যাঁর কলমে উঠে আসা পঙ্‌ক্তি 'সাঁঝের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে।' তথাকথিত মনসামঙ্গলের বেহুলা স্বামীকে বাঁচানোর যে ধ্বজা হাতে নিয়ে চলেছিল এক অজানা পথে তা যেন সমস্ত নারীর ক্ষেত্রে সত্যি হয়ে যায়। অর্থাৎ বেহুলাকে ছাড়িয়ে এর তাৎপর্য পৌঁছে যায় যুগ যুগান্তরের নারীর ক্ষেত্রে। এহেন শক্তিমান কবিও কিন্তু দেশভাগের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাননি। তাঁর কবিতাতে উদ্বাস্তু অর্থাৎ যে বাস্তুভিটেহারা তার চালচিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর 'উদ্বাস্তুর ডায়েরি' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

যে কেড়েছে বাস্তুভিটে সেই কেড়েছে ভয়।

তিনি আজ ভয় পান না বাস্তুভিটে কাড়া মানুষকে, কারণ আকাশজুড়ে তাঁর আত্মপরিচয় আছে। কেউ তাঁর এই পরিচয় ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আজ তিনি, যে প্রতিহিংসা অসম আন্দোলনে উঠে এসেছে, তা জয় করতে পারেন। এই মানসিকতায় তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখানে তাঁর থাকবার অধিকারে কোনো ভুল নেই।

'মেখেলা-পরা বোন দিয়েছে একখানা তাম্বুল
এবার আমি পাঠ নিয়েছি — আর কিছুতে নয়,
ভাষাবিহীন ভালোবাসার বিশ্ববিদ্যালয়।
বাংলা আমার আই-ভাষা গো, বিশ্ব আমার ঠাঁই
প্রফুল্ল ও ভৃগু আমার খুল্লতাত ভাই!' (তদেব, পৃ. ৬৪)

তাইতো 'মেখেলা পরা' অসমের বোন তাঁকে দিয়েছে পান-তাম্বুল। এই যে মেখেলা-বোনের আহ্বান আকুতি আর যুদ্ধ নয়, এবার সহাবস্থান চাই। তাই তিনি পাঠ নিয়েছেন ভাষাবিহীন এক বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে। বাংলা তাঁর আই ভাষা। এখানে উল্লেখ্য আই শব্দটি অসমিয়া শব্দ। কিন্তু তিনি নির্দ্বিধায় শব্দটি প্রয়োগ করেছেন আইভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা বলে, আর বিশ্বের সর্বত্র তাঁর ঠাঁই আছে থাকবার। তাই তাঁর ভাই প্রফুল্লকুমার ফুকন[১৪] আর ভৃগু ফুকন[১৫] তাঁকে দিয়েছেন তাঁর জগৎ খুঁজে নিতে।

আবার ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কবি বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত[১৬] লিখেছেন 'ঠিকানা'। এমন একটি কবিতা যা যে কোনো নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি লিখেছেন বিদেশি নাগরিক যে তার ভিটে মাটি হারিয়েছে অর্থাৎ পৃথিবীর যেকোনো স্থান-কালে 'ঠিকানা' কবিতাটি প্রসঙ্গিক। বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত মূলত পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছিলেন চাকরি সূত্রে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়। এখানে এসে তিনি এই স্থানকে আপন করে নিয়েছিলেন।

তাই তিনি বলেছেন, এক-দুই-তিন বার তলি দিয়ে স্পষ্ট হোক, সহ্য হোক মাটি। কোথাও তো অন্তত বালু ফিরিয়ে দাও, যার যা পাওনা, এমনকি মরুভূমি, লবণ চাষ যা-ই হোক, একটা আশ্রয় অন্তত দেওয়া হোক।

নাগরিকতার ছাপ তো কলাপাতা, শশাফুল বা কলমীলতারও থাকে। তবে যিনি প্রবাসী তার দোষ কী? মায়ের রক্তে বাস করে শিশু তবু পাতার মুকুটই হোক না কেন ওটা পিতৃপুরুষেরই পাওনা। কোনো নদীতে স্নান হয়, কোনোটায় আবার চোরাবালি গিলে খায়, কোনো নদীতে আবার আহার বিহারও চলে।

কবির প্রশ্ন, বিদেশি নাগরিকের কাছে প্রশ্ন, যে সেই বিদেশী কোন মাটি, কোন গড়ন, কেই-বা তার ফুল। আজ চাষা তাকে কোথায় বুনতে কাঁধে ভোরের লাঙল ধরেছে। কতদূর সেই বাসস্থান, তা শূন্যে গিয়ে ঠেকবে কি? কতদূর সেই ঠিকানা আজও ভুল হয় খুঁজে বার করতে।

বস্তুত বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত এই কবিতার মাধ্যমে এ কথাই স্পষ্ট করেছেন যে, যে দেশে তিনি এসেছেন তিনি তাকে ভালোবাসেন। ভালোবাসেন এ দেশের প্রকৃতি কিংবা মানুষ সবাইকে। কিন্তু তবু তাঁকে বিদেশী অভিধায় ভূষিত করা হচ্ছে।

এভাবেই কবি বীরেন্দ্র নাথ এই 'বিদেশী' অভিধায় ভূষিত মানুষের জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি তাঁর কবিতার ছন্দনৈপুণ্য, বিশেষণ, ইমেজ, স্বকীয়তা নিয়ে অম্লান হয়ে রয়েছেন।

কবিতা যে প্রকৃতপক্ষে মন্ত্র এই বোধ নিয়ে অসমে প্রথম কবিতা লেখেন মরিয়নির অধ্যাপক সত্যেন চৌধুরি[১৭]। অসমিয়া কবি দুর্গা হাজরিকার[১৮] সঙ্গে যৌথভাবে তিনি 'সাঁকো' নামে একটি কবিতা-পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৯৭১ সালে। অনেকটা সমর সেনের মতোই কবিতার জগৎ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছেন। এই সময় এরকমই বোধ হয়। অথচ সমকালীন সময়ে সত্যেন চৌধুরি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিমান কবি—

"ভোগদৈ তোমার রুপোলি খামে
আমি
আমার মায়ের চিঠি পাই।
নিশুতি রাতে
যুদ্ধ যখন থেমে যায়
পরাজিত সৈনিক
বিপক্ষ দলের শিবিরে বন্দী
তখন
ভোগদৈ ; তোমার রুপোলি খামে
সোনালি চিঠি আসে। আর
সে চিঠিতে মুক্তির আনন্দ।"

পূর্ববাংলা পৃথক হয়ে গেল। কাতারে কাতারে মানুষ অসমে চলে এল। কবি সেই যুদ্ধের পরাজিত

সৈনিক। ভোগদৈ নদীর পারে সেই সৈনিকের কাছে রুপোলি খামে সোনালি চিঠি আসে। এই যে যুদ্ধ এবং পরবর্তী অবস্থায় বন্দি সৈনিকের অত্যন্ত সুন্দর চালচিত্র ফুটে উঠেছে।

ভারত বিভাগের পর বাংলাদেশ থেকে প্রচুর বাঙালি আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের কবিতায় দেশভাগ ও তজ্জনিত উদ্বাস্তু মনোবেদনা থাকবেই। আর তাই রামেন্দ্রসুন্দর দেশমুখ্যের কবিতায় উঠে আসে—

'যখন যেখানে থাকি জন্মভূমি তোমাকে ভুলি নে,

স্মৃতির আনন্দ ভূমি, শৈশবের সবুজ শহর

চক্ষে আষাঢ়ের ধারা বক্ষভাবময়ী নদীজলে

গন্ধরাজ গোলাপের চোখের তারায়

হারানো কোমল সুরে বরাকের কুঞ্জতল থেকে

আমার মনের বৃন্দাবনে

আমাকে যে ডাক দাও।' (তদেব, পৃ. ৩৯)

আবার এই অসম আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই ফুটে উঠেছে দিলীপকান্তি লস্করের[১৯] কবিতা 'বধ্যভূমি আসাম'।

কবি ওই ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে— যে তিনি দেখছেন কারো দরজা খোলা নেই। তিনি কড়া নেড়ে ফিরে গেছেন, তাঁর মাথায় আসছে না পাড়ার এত লোক সবাই কোথায় গেল? ওরা কি কোথায় ঘুরতে বেরিয়েছে নাকি অজানা আশঙ্কায় কখন আক্রান্ত হবে এই ভয়ে ভেতর থেকে তালা বন্ধ করে লুকিয়ে আছে? পাশের পাড়ায় কোনো শব্দ নেই— ওরা পাষাণ। বন্ধনার পাথর জমে প্রত্যেক প্রহরেরা তুষারের মতো ঠান্ডা ও নিশ্চুপ ঝরে পড়ছে। এক নিস্তব্ধতায় রক্ত ঝরে জমে কাঠ হয়। বাতাসে কোনো ফুলের গন্ধ আর নেই এই 'বধ্যভূমি অসম'— এ শুধু গন্ধ আর লাশের নিঃশ্বাস।

কবি এই অসম আন্দোলনে বাঙালিদের এই ভয়াবহ অবস্থায় শঙ্কিত। কোথায় যাবে এই উদ্বাস্তুর দল। কে তাদের ঠাঁই দেবে। এই দেশকে তারা ভালোবাসে তবু এ দেশের লোকেরা কেন এদেরা আপন করতে পারে না?

এভাবে ব্রহ্মপুত্র বরাক উপত্যকার সব কবিদের কবিতাতেই মোটামুটি ভিটে-মাটি হারা হয়ে অসমে বাসকালীন যে আশঙ্কার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা কোনো না কোনোভাবে ফুটে উঠেছে।

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু চেতনার অপূর্ব ছবি এঁকেছেন অমলেন্দু গুহ[২০]। আমরা জানি তাঁর 'লুইত পারের গাথা'ই অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু 'বিদেশি খেদা' আন্দোলনের একটি কবিতা 'লালন মঞ্চ' প্রকাশিত '১৯ এর কবিতা ও গান' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতাটির নাম 'অ মোর অসম দেশ মরমিয়া'। কথাটির অর্থ সবার কাছেই স্পষ্ট 'ও আমার ভালোবাসার অসম দেশ'। তিনি এভাবে লিখেছেন— এ দেশে সবটাই তো ঠিক ছিল, সুন্দর ছিল জীবন। এ দেশের মাটি মায়ের মতো তাঁকে মমতা দিয়ে আগলে ধরেছে। 'মাঠের খাণিকীমধুরী ধানে' সাদা দুধ এসেছে

মায়ের স্তন্যের মতো। তাঁর জন্য মধুতে ভরে উঠেছে কমলালেবুর কোয়া। প্রতিবেশী অসমিয়া মায়াবী মেয়েটি তাঁর মায়ার আঙুলে ফুল তুলেছে বিহুয়ানে। 'বিহুয়ান'[২১] কথার অর্থ হল বহাগ বিহুতে যে উপহার দেওয়া হয় সেটা, এই বিহুয়ান তাঁকে লজ্জায় আরক্ত আনত হয়ে দিতে এসেছে মেয়েটি 'মেজি'[২২]— জ্বলা সাঁঝে তবু কখনো তাঁকে দুচোখের জল মুছতে হয়। কারণ তিনি নাকি বিদেশি, এ মাটি তাঁকে স্তন্য দেয়নি কখনো।

লুইতের পারের সাদা ধবধবে বালু যেখানে হয়তো কাছিমেরা ডিম লুকোয়, শৈশবে সেই বালু দুহাতে খুঁড়ে কতই না বালুর বাঁধ বেঁধেছেন, আর অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করেছেন। কিন্তু সে সবই এখন কেবল স্মৃতি— যা কবির মনকে নিরন্তর কুড়ে কুড়ে খায়। কেননা এখন যখন 'প্রাগজ্যোতিষের' অফিসে কবি যান চাকরির খোঁজে তখন কবির ভাষাকে দাঁড়াতে হয় কাঠগড়ায়। কবিকে শুনতে হয় যে তিনি যে ভাষায় কথা বলেন তা খাঁটি লুইত পারের ভাষা নয়। তার অর্থ কবি লুইতপারের সন্তান নন। কবির মন মুচড়ে ওঠে 'অপমানে, বেদনায়'।

কবিকে যখন লজ্জায় আরক্ত মুখে উপহার দেয় 'তাঁতশাল শোভা বিহুয়তী মেয়ে'। কিংবা রাতের রানি জোছনা যখন তাঁর উঠোনে হাসিতে ছড়ায় হিরের কুচি, ওরা তো চায় না কবির 'ডোমিসাইলের' লিপি। কিন্তু যখনই আবার তাঁর প্রাণভোমরাটিকে কলেজে ভর্তি করতে যান, কিংবা তাঁর 'অ্যান্টিকে ছাপা' বইখানি ছাপাতে চান, তখন চতুর্দিক থেকে একটিই জবাব আসে যে তিনি যে এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা, তা সম্পর্কে হাকিমের পরিচয় লিপিখানি কোথায়? কবি এই প্রশ্নকারীদের হাতে তুলে দেন জমির দলিল, 'খাজনার চিঠা'। কিন্তু এক নতুন আইন নতুন হাকিম তখন চোখ রাঙিয়ে, মাথা নেড়ে কড়িকাঠে চোখ রেখে বলেন যে তাঁকে তাঁরা চেনেন না। কবিও অপারগ, আর কী-ই বা দেবেন পরিচয়পত্রের জন্য? কীভাবেই-বা প্রমাণ করবেন যে তিনি লুইতের পারের ছেলে। এই অসম তাঁর অত্যন্ত আদরের মায়ের মতো।

এভাবেই এই লুইতপারের সন্তান পাথরে মাথা কুটতে কুটতে চলেন, নিজের পরিচয়কে সাব্যস্ত করার পন্থা খুজঁতে গিয়ে। কিন্তু আশা ছাড়েননি। তিনি তাঁর আশার কথা বলেছেন এভাবে—

'বলি অধিকার বোধের আহত হৃদয় জ্বেলে
'ও মোর অসম দেশ সুচিকন। আ মরি বাংলা ভাষা।'

(১৯-এর কবিতা ও গান, পৃ. ৩৬৩)

মুহূর্তে যেন পাথরের ভার মন থেকে সরে যায়, এক ক্ষুব্ধ অভিমানী হৃদয় বলে ওঠে—

'এ মাটি আমারো এজমালী ঘরে শরীক কত না ভাই'; কবি নানান ভাষাতে কথা বললেও তবু একটি কথাই—

'...আমাদের মন ভরে
একটি কথাই— মাথা উঁচু করে বাঁচতে, হাসতে চাই।'

এক আকাশ তারার দিকে চেয়ে কবি শান্তির ঘর খোঁজেন, কখনো 'মিকিরের চাঙে', কখনো 'অসমীয়া গাঁয়ে', কখনো আবার 'ভগনীয়া বস্তিতে'। লুইতের বানে ঘর ভাঙে তবু বেহুলার মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে

লড়াই করেন। পুঁইমাচায় যখন তাঁর ঘর ভরে তখন স্বস্তিতে মন ভরে ওঠে।

সাদা ধবধবে লুইতের পারের মাটিতে কাছিমেরা ডিম পাড়ে। কবির ভাইয়ের মুখ চকচক করে বন্ধুত্বের ভালোবাসা। দীঘলি দিঘির কোণটায় বসে গান সে বারে বারে—

'ও মোর অসম দেশ মরমিয়া, আ মরি বাংলা ভাষা।'

আবার এই অসমের ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে ড. তপোধীর ভট্টাচার্য[২৩] তাঁর 'ভূমিপুত্র জাতক : ১৯৮৫'— কবিতায় লেখেন— কবির নতুন জাতক, ভূমিপুত্র, 'পরবাসী বোধিসত্ব' কিছুই নেই তাঁর। তাঁর কাছে সব দেশই বিদেশ।

কবির যেন মেধা নেই, বুদ্ধি নেই, ঋতুচক্র নেই, শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে মুখ গুঁজে খড় ও বিচালি খেয়ে যান। অর্থাৎ তাঁর কোনো নিজস্বতা বা আপনত্ব নেই। মাঝে মাঝে তাঁকে শিখতে হয় শ্রুতি, দ্রাঘিমা— কোন রেখায় তিনি আছেন। নির্বিবাদে শিখে যান। প্রতিবাদ করেন না।

কিন্তু এভাবে জীবন কাটাতে কবি ক্লান্তি বোধ করেন। তাই তিনি লেখেন—

'বাচাল ছায়ায় যত বেড়ে উঠি
শস্য-ভাঁড়ারের শোকে মাথা পুড়ি তত।
ত্রিপাদ ভূমির কথা মনে পড়ে, ব্রাত্য জন্মে
পরমান্ন নেই, নেই জেগে ওঠা।'

— কবি বোধিসত্ব, নির্বিকার নতুন জাতক। তিনি চিরদিন প্রবাসী। তাঁর কোনো স্মৃতি নেই, পারম্পর্য নেই। শুধু আছে পোড়া মাটি, 'বাস্তুহীন ছায়ার আড়াল'। সব দেশই কবির কাছে বিদেশ।

আবার এই প্রসঙ্গ টেনেই আরেকজন বরাকের কবি কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য[২৪] লিখছেন—'স্বদেশ হলো বিদেশ' নামের কবিতা। কবিতাটিতে কবি লিখছেন যে— দেশ জুড়ে টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু এ আসলে বৃষ্টি নয়, রক্ত ঝড়ার মর্মান্তিক ধ্বনি। প্রসঙ্গত বলে নিই 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'— বাংলার একটি বিখ্যাত ছড়া। অনেকদিন পরার পর যখন টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ পাওয়া যায়, মনটা যেন কোথায় হারিয়ে যায়। ভিজে মাটির গন্ধ মনকে এক নতুন আস্বাদ দেয়। কিন্তু কবির বৃষ্টি নৃশংসতার উজ্জ্বল উদাহরণ। এই টাপুর টুপুর শব্দ জন্তুর মানুষের অত্যাচারে নিহত কিংবা আহতদের রক্ত ঝরছে।

একদিন রাতে মানুষের পৈশাচিক মনোবৃত্তি অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মতো নেমে এল। প্রচুর বাঙালি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। কবিও সেদিন বিচ্ছিন্নতার হাতে টুকরো হলেন। কারণ এ রক্ত তাঁর আপন ভাষাগোষ্ঠীর রক্ত। কী দোষ এদের? শুধু ভাষাটা এক নয় বলে কি তাদের এভাবে রক্ত ঝরাতে হবে?

দেশ জুড়ে সেদিন রক্তস্রোতের বন্যা নামে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থ' সেদিন থেকে বিদেশ হয়ে যায়।

শুধু একটা ভাষার ব্যবধান কীভাবে মানুষকে এরকম পৈশাচিক জান্তব মানসিকতা দেয় কবি তা জানেন না, তিনি শুধু লিখলেন এখন থেকে তিনি বিদেশি।

আবার বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের কলমও সোচ্চার হয়েছিল অসমের ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে।

তবে তাঁর কবিতাটি পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বসে লিখলেও তা ততটাই প্রাসঙ্গিক হত বলে মনে হয়।

কবিকে প্রশ্নের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় এই মর্মে যে তাঁর কোনো ভাষা বা ধর্ম আছে জাতি আছে কি? তাঁর স্থান কোথায় ভারতবর্ষে না অন্য কোনো স্থানে? যাঁরা প্রশ্ন করছেন তাঁদের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত দৃঢ়। কারণ তাঁদের নিজস্ব ভাষা আছে, ধর্ম আছে, নিজেদের জাতি আছে, জাতিভিত্তিক ভোট আছে। কিন্তু কবির রাজ্য ও রাজধানী ভারতবর্ষ। তাই কবির চেহারা কেউ দেখেনি। তেত্রিশ বছর পেরিয়ে গেল 'কেউ কথা রাখেনি'। প্রসঙ্গত কবি এখানে নেতাজির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। নেতাজি বলেছিলেন 'তোমরা আমায় রক্ত দাও। আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো।'

'এক বুড়ো বলেছিল তোমরা আমার সঙ্গে উপবাস করো
আমি তোমাদের রামরাজ্য দেব
যুবক অন্তর্হিত, বুড়োর নাতি-পুতি
ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে নিজেদের চেয়ার টেবিল।'

(তদেব, পৃ. ২২)

— তাই এখন এই বিদেশি সংজ্ঞায় ভূষিত আমাদের দেখে তাঁরা উপহাস করেন। তাঁরা বলেন না তোমরা রক্ত দিয়েছ, না উপোস করেছ। তাই তো আজ তোমাদের এই চেহারা। একদম চেনা যায় না। আর মাকে চেনা যায় না, তাকে চিনবেই-বা কী করে? কেমন করে এই মহাপুরুষেরা বলবেন যে এই কাপুরুষেরা তাদের দেশবাসী। তাহলে তো ঠিকই আছে তারা তো বিদেশিই বটে।

তাই কবি আক্ষেপ করে বলছেন—

তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি
কেউ কথা রাখে না।

বস্তুত বিজিৎকুমারের এই কবিতাটি পক্ষান্তরে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ সময়টা আটের দশক আর তখন অসমে ভাষা আন্দোলন একদম চরমে। যারা নিজের দেশের জন্য কিছু করতে পারেনি, তারা যেখানেই থাক না কেন বিদেশি হয়েই থাকবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কবিতাটি প্রাসঙ্গিক।

অন্যদিকে আবার লুইত পারের কবি সুধীন সেন[২৫] লিখেছেন এই প্রেক্ষিতে 'হায়, মৃত মানবতা'। তিনি লিখছেন এভাবে—

অসম আন্দোলনের সময় যারাই ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, জনপদ ছারখার করেছে, বাঙালিদের ভাই বোন জননীর শিশুর রক্তে হাত ভিজিয়েছে তা লুকোবে কোথায়? হঠাৎ ভুঁইফোঁড় এই ভূমিপুত্রদের কবি বলছেন যে তারা এক একটা নিহত বিবেক, নিহত হৃদয়ের অধিকারী। কোথায় মানবতা? 'নেপথ্যবাসী খলনায়কেরা যারা মুদ্রার ক্রীতদাস।'

লুইতের এই ধারা পশ্চিমে যায়, নিজেই সাজায় রূপসী বাংলাদেশকে। তারা কি পারে এই লুইত ধারার গতি ফেরাতি? উপহার স্বরূপ বারবার বাংলাদেশের মেঘদল আসে অসমের মাটিকে ফসল ফোটাতে,

তাকে শস্য শ্যামলা করতে। পারে কি এই নৃশংস বিবেকহীন লোকগুলো তাদের ফিরিয়ে দিতে।

বন্যা ও ভূমিকম্প, কিংবা দাবানল অথবা মড়ক ঘূর্ণিঝড় যখন আসে তখন ভাষা-ধর্ম-জাতির দোহাই দিয়ে কেউ রক্ষা পেয়েছে কি? একথা কি বলতে পেরেছে তখন তারা অসমিয়া, বাঙালি, পাহাড়ি, হিন্দু বা মুসলমান— প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন তাদের রক্ষা করে।

এর উত্তর জানে আদিকাল ধরে বয়ে আসা লোহিত বা ব্রহ্মপুত্র, জানে নীল পাহাড়েরা আর জানে কাজিরঙা বন।

এমনি করেই আরও কতবার মানুষ নামক জন্তুর তাণ্ডবে ছারখার হয়ে গেছে ঘরবাড়ি সংসার।

ভাগাড়ে কত শকুন, দেশি শেয়ালেরা নেমেছে, বাজপাখির নখ কত হৃদয় ছিন্ন করেছে। তবু শান্তির পায়রা একদিন আসবেই। শ্মশানে আবার নতুন জীবন বাঁধবে, ঘর বাঁধবে।

'হৃদয়ের শ্লোক হয়ে নামে শব্দের সিঁড়ি বেয়ে—

বিধবাস্মৃতির পাশে এসে স্থির, নিশ্চুপ সান্ত্বনা' (তদেব, পৃ. ৮)

কবি আশাবাদী। এই ক্রোধের আগুন নিভলেই দ্বেষরূপী কেউটেকে বশ করবে ভালোবাসা। মৃত মানবতা একদিন আবার জেগে উঠবে—

— আশা বন্দরে এই ভারী বিশ্বাস

নোঙর ফেলেছি, হে আসাম, কবে শম্বুক হবে শঙ্খ সমুদ্রেরা'

প্রত্যেক কবিই অসম আন্দোলনের ভয়াবহতার চিত্রই এঁকেছেন। কিন্তু তাঁদের সকলের সঙ্গে কবি সুধীর সেনের তফাত এখানেই যে তিনি আশাবাদী কবি। তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস এই হিংসার আগুন একদিন নিভবে। আবার বন্ধুত্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রদীপ জ্বলবে।

তথ্যসূত্র

১. মানিক দাস— প্রাবন্ধিক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম প্রধান গদ্যকার।
২. অসম মিহির— অসমে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা। গুয়াহাটি থেকে ১৮৭২ সালে প্রকাশিত।
৩. হিতসাধিনী— অসমে প্রকাশিত প্রাচীন বাংলা পত্রিকা। গোয়ালপাড়া থেকে ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত।
৪. সাহিত্য সেবক— অসমে প্রকাশিত প্রাচীন বাংলা পত্রিকা। ধুবড়ি থেকে ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত।
৫. আসামে বাংলা ভাষার সংকট — অসম বাঙালি জাতিসত্তার ভাষিক সংকট নিয়ে অসম, পূর্ববঙ্গ, বঙ্গ, ত্রিপুরার বিশিষ্ট বাঙালি ও অসমিয়া লেখকদের রচনার একটি সংকলন।
৬. খিলঞ্জিয়া— অসমের ভূমিপুত্র।
৭. ডিটেনশন ক্যাম্প— ভারতে বসবাসকারী অবৈধ বিদেশিদের এখানে রাখা হয় নারকীয় পরিস্থিতিতে।
৮. ঊর্ধ্বেন্দু দাস— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম প্রধান কবি।
৯. বিষণ্ণ পরবাস নির্বাসন নয়— ঊর্ধ্বেন্দু দাস রচিত কবিতার নাম।
১০. হাকালুকি — এক ধরনের বুনো ফল, স্থানীয় নাম ভুবি।
১১. লালন মঞ্চ — দিলীপকান্তি লস্কার সম্পাদিক ছোট পত্রিকা।
১২. বিজিৎ ভট্টাচার্য — বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট কবি, 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক।
১৩. শক্তিপদ ব্রহ্মচারী — অসমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।
১৪. প্রফুল্লকুমার ফুকন— রাজনীতিক, অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।
১৫. ভৃগু ফুকন— রাজনীতিক, অসমের প্রাক্তন গৃহমন্ত্রী।
১৬. বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত— কবি, অধ্যাপক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ— পরবাস, একা থাকো, ৩২ যোগিনী বসিবেক।
১৭. সত্যেন চৌধুরী — কবি, অধ্যাপক। একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'সাঁকো'।
১৮. দুর্গা হাজরিকা— অসমিয়া কবি। একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'সাঁকো'।
১৯. দিলীপকান্তি লস্কর — কবি, 'লালনমঞ্চ' ছোট পত্রিকার সম্পাদক।
২০. অমলেন্দু গুহ— কবি, গবেষক। একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'লুইত পারের গাথা'।
২১. বিহুয়ান— বিহুর সময় গুরুজনকে প্রদত্ত উপহার।
২২. মেজি — পৌষ মাসের বিহুর আগের রাতে শুকনো পাতা, কাঠ, খড় দিয়ে বানানো ঘর।
২৩. তপোধীর ভট্টাচার্য — কবি, প্রাবন্ধিক, আলোচক, শিক্ষাবিদ। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'বিষণ্ণ গোধূলি'।
২৪. কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য — লোকসংগীত গবেষক, শিল্পী। কয়েকটি কবিতাও লিখেছেন।
২৫. সুধীন সেন — ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অনালোচিত কবি